অল্প-স্বল্প গল্প

কাইউম পারভেজ

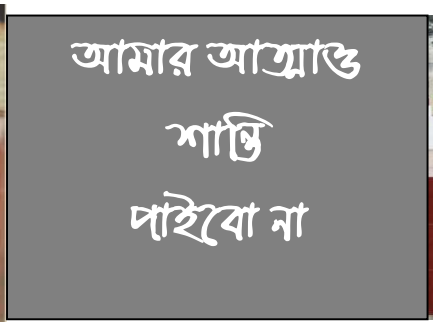

গল্পটা তাঁর কাছ থেকেই শোনা। স্বাধীনতার পর বিভিন্ন বিজয় মেলা এবং অন্যান্য সভায় তাঁকে অতিথি করে নিয়ে যাওয়া হতো তাঁর যাদুকরী বক্তৃতা শোনার জন্য। কোন্ অনুষ্ঠানে ঠিক মনে নেই। টাঙ্গাইলে বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীর অস্ত্র সমর্পনের অনুষ্ঠানে বা অন্য কোন সভায় হতে পারে আজ আর মনে করতে পারছি না। যা হোক ঘটনাটা হলো প্রচুর লোক সমাবেশ সে সভায়। নিরাপত্তা রক্ষীদের ঠেলে ঠুলে এক বৃদ্ধ মঞ্চে আসার চেষ্টা করছেন। নিরাপত্তা রক্ষীরা তাঁকে রুখে দিচ্ছেন তবু বৃদ্ধ বেপরোয়া। অবশেষে আয়োজকদের নির্দেশে বৃদ্ধকে মঞ্চের দিকে আসতে দেয়া হলো। বৃদ্ধ তাঁর সামনে এসে কাঁদতে লাগলেন। হাতে মাটির সানকিতে কিছু ভাত আর তরকারী। বলছেন - নয়টা মাস রেডিওতে আপনার কথা হুনছি আর আল্লাহর কাছে আপনার হায়াত চাইয়া দোয়া করছি। আল্লাহরে কইছি যদি আল্লাহ আমারে আর আপনেরে দ্যাশ স্বাধীন হওনতক বাঁচাইয়া রাখে তইলে আপনেরে খুঁইজা বাইর কইরা আমি আপনার ঝুটা খামু। বাবা আজ আমি আপনারে পাইছি। এই সানকিতে কইরা দুইটা ভাতও লইয়া আইছি। আপনি একটু ঝুটা কইরা দ্যান। আমি খামু। তিনি অপ্রস্তুত। এমন কান্ডতো কখনো দেখেননি - শোনেনও নি। যাহোক আসপাশের সবার অনুরোধে তিনি সানকি থেকে একটু ভাত নিয়ে খেলেন। বৃদ্ধ চোখের পানি মুছতে মুছতে তাঁর পায়ে সালাম করে মঞ্চ থেকে নেমে গেলেন।

বৃদ্ধ যাঁর পায়ে সালাম করে নেমে গেলেন তিনি 'চরমপত্র' খ্যাত এম আর আখতার মুকুল। আজ তাঁর ষষ্ঠতম মৃত্যু দিবস। এ দিবসটিতে এসে দেখতে পাই কেমন ভাগ্যবান এক মানুষ ছিলেন তিনি। ভাগ্যবান এজন্যই যে এ পৃথিবীতে অর্থ ধনদৌলত নাম যশ এগুলো চেষ্টা করলে এবং কপালের লিখন থাকলে কিছুটা হলেও পাওয়া যায় কিন্ত মানুষের ভালোবাসা পাওয়া নিতান্তই ভাগ্যের যা এম আর আখতার মুকুল জীবদ্দশায় এবং মৃত্যুর পরও পেয়ে যাচ্ছেন। এবং তা সাধারণ মানুষের কাছ থেকেই যাঁরা অনেকেই কখনো হয়তো কাছে থেকে তাঁকে দেখেননি। দেখেছেন অন্তরের জ্যোতি দিয়ে যে জ্যোতির মধ্যমনি 'চরমপত্র'। আজকের প্রজন্মের কাছে 'চরমপত্র'-র জনপ্রিয়তা, এর যুদ্ধাংদেহী শক্তি ও অনুপ্রেরণা, যুদ্ধজয়ের প্রত্যয়ের স্বপ্নটা যে কী তা বোঝানো হয়তো সম্ভব নয় বিশেষ করে যাঁদের জন্ম একাত্তরের পর। তথাপি সেই মহান মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে এর গুরুত্ব সবাই অনুধাবন করতেন। বিচ্ছু থেকে শুরু করে অবরুদ্ধ বাংলার মানুষ ছাড়িয়ে শরণার্থীসহ দুই বাংলার কোটি কোটি শ্রোতা সকলেই অনুধাবন করতেন ওটা কি বুলেট। এমনকি রাজাকারের দলও। ওরা শুনতো কেবল জানার জন্য ওদের 'খতম তারাবী'র আর কতটা বাকী। ওদিকে "এ্যায় মেরে জান, পেয়ারে দামান, নূর এ

চামান, আসমান কি চাঁদ, আঁখো কি তারা সদরে ইয়াহিয়াকে তাঁর পেয়ারে ঠ্যাঁটা মালিক্কাও তাঁকে বঙ্গাল মূলুকের খবর দিতো এই চরমপত্রের শাণেনযূল দিয়ে। বঙ্গাল মূলুকে ভোমা ভোমা সাইজের মছুয়াদের রাজত্ব কবে শ্যাষ হবে, বিচ্ছু গো গাবুরিয়া মাইরের সর্বশেষ পরিস্থিতি কি, বকশী বাজারের ছক্কু মিয়া কবে কাউলারে দিয়া চক বাজারের চৌরাস্তার মাইধ্যে সাইনবোর্ডে ল্যাখাইয়া নিবে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বঙ্গাল মূলুকে মছুয়া নামে এক কিছিমের মাল আছিলো। হ্যাগো চোটপাট বাইড়া যাওনের গতিকে হাজারে হাজারে বাঙ্গালী বিচ্ছু হ্যাগো চুটিয়া মানে কিনা পিপিলিকার মত ডইল্যা শ্যাষ করছিলো। টিক্কা-মালেক্যা গেলো তল পিঁয়াজী বলে কত জল। এ সব শোনার জন্যই সবার তখন হাপিত্যেশ। এ 'চরমপত্র' শোনার কারণে কাওকে কাওকে প্রাণ দিতে হয়েছে, কেউ জেল খেটেছেন, কেউ পাকসেনা রাজাকারদের নির্যাতন সয়েছেন, কেউ এসএলআরের গুলি আর মনের বারুদ খুঁজে পেয়েছেন। কেউ যুদ্ধ জয়ের আশা দেখেছেন, কেউ বঙ্গবন্ধুকে ফিরে পাবার আলো দেখেছেন। সবাই একটি নতুন দেশ একটি নতুন জীবনের আলো দেখেছেন। যে আলো দেখেনি গোলাম আযম-নিজামী-মুজাহিদী গংয়েরা। এখন নাকি ওরা আলো দেখতে শুরু করেছে। বঙ্গবন্ধুর গুনাবলীর সন্ধানে নেমেছে। ধিক্। ধিক্ ওদের ধিক্। চরমপত্রের ভাষায় বলতে হচ্ছে - 'এ্যালায় কেমন বুঝতাছেন! ঠেলার নাম জশমত আলী মোল্লা ...।'

বলছিলাম এ প্রজন্মের তরুণ-তরুণীদের কথা তারা চরমপত্রের কথা জানে কিনা, এম আর আখতার মুকুলকে চেনে কিনা! আমাদের ধারণা ছিলো বোধহয় না। কিন্তু সে ধারণা পাল্টে গেছে যখন শেষ সময়ে তাঁকে রক্ত দেবার জন্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের ভীড় লেগে গিয়েছিলো। তাঁদেরকে এম আর আখতার মুকুলের ছেলে মেয়েরা জিজ্ঞেস করেছিলেন রক্তের প্রয়োজন আপনারা জানলেন কোত্থেকে? কেন আমরা টিভিতে শুনেছি। কিন্তু আপনারা কি তাঁকে চেনেন? জানেন তিনি কে? কেন জানবো না আপনারা এসব কি বলছেন? যারা বাংলাদেশকে ভালোবাসবে বাংলাদেশের ইতিহাস জানতে চাইবে তাদের এম আর আখতার মুকুলকে খুঁজে বের করতেই হবে। তাঁর অবদানের কথা জানতে হবে। এম আর আখতার মুকুল স্বাধীনতার অংশ। আপনারা তাঁর চরমপত্র শুনেছেন? না শুনিনি। আমরা তাঁর 'আমি বিজয় দেখেছি' পড়েছি। একজন বললো কতবার পড়েছি গুনিনি তবে ওটা সারাজীবনই পড়তে হবে। একজন ছাত্রী বললো আমার আব্বা ওনার গল্প এমনভাবে করেছেন যে আমাকে আর নতুন করে চিনতে হয়নি। আপনারা প্লিজ আমাদের কাছ থেকে রক্ত নিন। সারা জীবন গর্বিত হবার এ সুযোগটা হারাতে চাই না।

বরিশাল থেকে আহত এক মুক্তিযোদ্ধা শেষ সময়ে বারডেমে এসে অচেতন এম আর আখতার মুকুলকে স্যালুট করে বললেন - 'মোর কমেন্ডাররে শেষ সেলুটটা দিতে বরিশাল থাইক্যা আইছি। হে-ই আছিলো মোর কমেন্ডার। চরমপত্রের মইদ্দেই হে কইয়ে দেতো কি করতে অইবে। আপনে যাইবেন না স্যার এহনো অনেক কাম বাকী আছে।

তাঁর ছোট ভাই গিয়েছিলেন ফ্রিজ কিনতে। এ কথায় সে কথায় দোকানী জেনেছিলেন তিনি এম আর আখতার মুকুলের ছোট ভাই। দোকানী তিন হাজার টাকা দাম কম রেখে বললেন ওনারে আমার সালাম দিয়েন। ওনার মত মানুষের জন্য আমরা কিছু করতে পারি নাই। এম আর আখতার মুকুল তাঁর নিজের জন্য নিজেও কিছু করতে পারেন নি। অর্ধ শতাব্দীর বেশী ঢাকা শহরে কাটিয়ে দিলেন অথচ নিজের কখনো একটা বাড়ী হয়নি। হয়নি কোন স্থায়ী ঠিকানা। বলতেন গোটা বাংলাদেশই তো আমার ঠিকানা। যদি সরকার দয়া করে সাড়ে তিন হাতের একটা জায়গা দেয় তবে ওটাই হবে শেষ ঠিকানা

নয়তো পিতা সা'দত আলী আখন্দের তৈরী বগুড়াতে পারিবারিক গোরস্থানই হবে আমার স্থায়ী ঠিকানা।

বৈচিত্রময় জীবন ছিলো তাঁর। বাবার পুলিশি চাকরীর সুবাদে ম্যাট্রিক পরীক্ষার আগেই পড়েছেন বিভিন্ন জেলার ৮টি স্কুলে। ছাত্রজীবন থেকেই রাজনীতিতে আগ্রহ এবং সরাসরি অংশ নিয়েছেন তেভাগা আন্দোলন থেকে শুরু করে ভাষা আন্দোলন পর্য্যন্ত। দেখেছেন তিরিশ দশকের সন্ত্রাসী আন্দেলন, বিয়াল্লিশের অসহযোগ আন্দেলন, তেতাল্লিশের দূর্ভিক্ষ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং ভারতের স্বাধীনতাসহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। জেল খেটেছেন। ১৯৪৬-এ বঙ্গবন্ধুর সাথে পরিচিত হয়েছেন কলকাতার কারমাইকেল হোষ্টেলে। সেই থেকে বঙ্গবন্ধুর ছায়াসঙ্গী এবং পরবর্তীতে সাংবাদিক হিসেবে সফর সঙ্গী। দৈনিক ইত্তেফাকের জন্মলগ্ন থেকে সাংবাদিকতা শুরু করে পরবর্তীতে আজাদ পূর্বদেশ এবং ইউপিআই-র ঢাকা ব্যুরো চীফ। এর ফাঁকে টুকটাক চাকরী করার চেষ্টা করেছেন এজিবি, সিভিল সাপ্লাই ও দূর্নীতি দমন বিভাগে। জেলখাটাসহ ছাত্র রাজনীতির তৎকালীন অগ্রহণযোগ্য রিপোর্টের কারণে সব ছেড়ে অবশেষে সাংবাদিকতা। স্বাধীনতার সময়ে মুজিবনগর সরকারের তথ্য ও বেতারের পরিচালক, স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্পের পরিচালক, লন্ডনে বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রেস মিনিস্টার এবং যুগ্ম-সচিব হিসাবে সরকারের অন্যান্য মন্ত্রনালয়ে দায়িত্ব পালন করেছেন। এ সব কিছুর আগে ১৯৫২-র শেষার্ধে কমরেড সুলতানের সাথে 'পুঁথিপত্র' নামের বইয়ের দোকান দিয়ে শুরু করেছিলেন ভরা যৌবনের কর্ম জীবন আবার শেষ জীবনে এসে সেই বইয়ের দোকান সাগর পাবলিশার্সে এসেই থিতু হলেন। যুগ্ম সচিব হিসেবে অবসর নেবার পর করতে পারতেন কনসালটেন্সী, অথবা সেই পুরোনো বাসট্রাকের ব্যবসা অথবা হতে পারতেন আমদানী রফতানীর কান্ডারী যে অভিজ্ঞতাও তাঁর ছিলো তবু সেগুলোতে আগ্রহ হলো না । বেছে নিলেন বইয়ের দোকানদারী। অভিনব এক শ্লোগান নিয়ে শুরু করলেন - তবুও বই পড়ুন। পয়সার অভাব সময়ের অভাব ইচ্ছার অভাব সঙ্গত যুক্তির অভাব যাই থাকুক - তবুও বই পড়ুন। বইয়ের ব্যবসা করেছেন পাশাপাশি নিজে পড়াশোনা করেছেন এবং লিখে গেছেন। অবিরাম লিখে গেছেন। পত্রপত্রিকায় নিয়মিত কলাম ছাড়াও ৩৫ খানা বই লিখেছেন। ১৯৬০-এ প্রকাশিত প্রথম বই পনী এক্সপ্রেস। যখন বুঝলেন ছোট হয়ে আসছে তাঁর পৃথিবী হাতে বেশী আর সময় নেই, স্থির করলেন না বলা কথা শেষ করে যেতে হবে দ্রুত। যে রোগ শরীরে ঢুকেছে সে-ই এবার তাঁকে 'চরমপত্র' দিয়েছে। তাই লিখতে শুরু করলেন আত্মজীবনীভিত্তিক বইয়ের প্রথম খন্ড 'শতাব্দীর কান্না হাসি'। মৃত্যুর পাঁচ মাস আগে সেটা প্রকাশ করলেন। দ্বিতীয় খন্ড 'ভয়ংকর দিনের প্রধানমন্ত্রী'-র লেখার কাজে হাত দিলেন। প্রায় শেষ করেছিলেন । প্রকাশ করার আর সময় পেলেন না। ওটা এখন তাঁর ছেলেদের দয়ার উপর বসে আছে কবে সে আলোর মুখ দেখবে।

সাংবাদিকতার জন্য রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সম্মান স্বাধীনতা পুরস্কার পেয়েছেন যদিও তাঁর বরাবরের আশা ছিলো 'চরমপত্র'-র জন্য বাংলাদেশ সরকারের স্বীকৃতি তিনি একদিন পাবেন। এ জন্য তাঁর মনে একটু দুঃখও ছিলো। মাঝে মধ্যে সেকথা বলতেন এবং প্রকাশও করেছেন তাঁর এক লেখায় - ... 'এবারের অনুষ্ঠানের একটা উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে যেসব মার্কিনী জাপানী এবং ভারতীয় বুদ্ধিজীবি সমর্থন দিয়েছিলেন তাঁদের জনাকয়েককে সরকারী অতিথি হিসাবে বাংলাদেশ সফরে আনা হয়েছে। ভারতীয় অতিথিদের মধ্যে সর্বশ্রী অন্নদাশংকর রায়, দেবদুলাল বন্দোপাধ্যায় এবং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আমার পূর্ব পরিচিত। ১৯৭১ সালে দেবদুলাল আকাশবাণী কোলকাতা কেন্দ্র থেকে নিয়মিতভাবে সংবাদ সমীক্ষা পাঠ করতেন। আর আমি যুদ্ধের দিনগুলোতে

প্রতিদিন বেতার কেন্দ্র থেকে 'চরমপত্র' অনুষ্ঠান উপস্থাপন করতাম। এ সময় দুটো অনুষ্ঠান দারুণভাবে জনপ্রিয় হয়েছিল। অবশ্য যুদ্ধের পর ভারত সরকার 'সংবাদ সমীক্ষা' পাঠ করার পুরষ্কার হিসাবে দেবদুলালকে 'পদ্মশ্রী' উপাধিতে ভূষিত করেছে। একজন বেতার কথকের জন্য এটা এক বিরল সম্মান। .... বহুদিন পর এবার ঢাকায় দেবদুলালের সঙ্গে দেখা হলো। দুটো সন্ধ্যা কাটালাম ওর সঙ্গে। চুটিয়ে আড্ডা মারলাম ঢাকা ক্লাবে। তবে কথাবার্তা সব একাত্তরের যুদ্ধকে নিয়ে। হঠাৎ দেবদুলালের একটা সরাসরি প্রশ্নের সরাসরি কোন জবাবই দিতে পারলাম না। শুধু বললাম - তাতে হয়েছে কি? স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে 'চরমপত্র' অনুষ্ঠান করে জনগনের অকৃত্রিম ভালবাসা পেয়েছি এটুকুইতো যথেষ্ঠ। বাংলাদেশ সরকারের স্বীকৃতি একদিন হয়তো পাবো কিন্তু সেটা হবে মরণোত্তর। দেবদুলাল হতভম্বের মতো তাকিয়ে রইলেন (সূত্র: একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা পৃঃ ১৬-১৭)।

সত্যিই জনগনের অকৃত্রিম ভালবাসা পেয়েছেন এ সৌভাগ্যবান পুরুষ। তাঁর অসুস্থতা এবং মৃত্যুর সময়ে দেশে বিদেশে দেখেছি তাঁর প্রতি মানুষের ভালবাসা। দেশে বিদেশে মানুষ ছুটে এসেছেন তাঁর জন্য। যেমন লন্ডনে তেমন ঢাকায়। কেউ খাবার নিয়ে কেউ টাকা পয়সা নিয়ে কেউ দু'চোখ ভরা জল নিয়ে কেউ একরাশ ব্যথা নিয়ে কেউ বা নিজের গায়ের রক্ত দান করার আশা নিয়ে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা থেকে শুরু করে মন্ত্রী নেতা নেত্রী আমলা কবি সাহিত্যিক শিল্পী মুক্তিযোদ্ধা ছাত্র শ্রমিক আপামর জনতা সবাই। হাজারে হাজারে মানুষ। তিনি তখন অচেতন। যদি জ্ঞান থাকতো তবে হয়তো তাঁর হৃদয়ে লালিত সেই কথা গুলোই চরমপত্রের ভাষায় বলতেন - কি পোলাটারে বাঘে খাইলো! আইজ থাইক্যা বঙ্গাল মুলুকে এম আর আখতার মুকুলের লগে কেউ আর দেখা পাইবেন না। তয় যাইবার আগে একখান কথা কইয়া যাই - ওই রাজাকার গুলানের বিচার আপনাগো করণই লাগবো। হেই গুলার বিষ যদ্দিন এই বাংলায় থাকবো তদ্দিন বাংলার মানুষের শান্তি নাই, শান্তি নাই। আমার আত্মাও শান্তি পাইবো না। বিচ্ছু গুলার ক্যাঁচকা আর গাবুরিয়া মাইরের হাত থাইক্যা ওগুলান বাঁইচ্চা গেলো কেমতে?

করুনাময় তাঁর সে বিগত আত্মার শান্তি দিন।